শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নারীর অধিকার

মোঃ নাবিল তাহমিদ

নারীর অধিকার আজকের বিশ্বে আর কেবল একটি আলোচ্য বিষয় নয় বরং এটি মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষা নারীর আত্মনির্ভরতার প্রথম শর্ত। আর সামাজিক নিরাপত্তা তার স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। একজন নারী যখন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হন, তখন তিনি কেবল নিজের জীবনই নয়, পরিবার ও সমাজকেও উন্নতির পথে এগিয়ে নেন। একইভাবে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাকে সহিংসতা, বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। তাই শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নারীর অধিকার রক্ষার মূল ভিত্তি এবং টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

বিশ্বে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। সকল কাজে পুরুষের প্রাধান্য নারীকে পেছনে ফেলে দেয়। কিন্তু এই পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে কখনোই সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে নারীকেও সমানতালে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। নারীর ন্যায্য অধিকারকে সমুন্নত করতে হবে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি জাতি সমৃদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারে। নারী শিক্ষিত হলে একটি গোটা জাতির উন্নয়ন সম্ভব। আর তাই নারী শিক্ষা হলো নারীদের অন্যতম প্রধান অধিকার। নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি এবং দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের মতো কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের এসকল নীতি ও উদ্যোগের ফলে শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট স্বাক্ষরতার হার ৭৭.৯% এবং নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৭৫.৮% এবং ৮০.১%। তবে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর ৫০.৭%, মাধ্যমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থীর ৫৩% ছাত্রী ও উচ্চ মাধ্যমিকে মোট শিক্ষার্থীর ৪৮.৭৫% ছাত্রী। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণও দিন দিন বাড়ছে। উচ্চশিক্ষায় মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ভর্তির হার ৪৫.৫৭%, যা বিগত বছরগুলোর চেয়ে বেশ সন্তোষজনক। ২০২৫ সালে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬৩% ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাতেও নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। কারিগরি শিক্ষাতে ২০২৩ সালে মোট শিক্ষার্থীর ২৯.৫৩% নারী ছিল, যা ২০২২ সালে ছিল ২৭.১২%। যদিও উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনো তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে বাড়ছে, তবে নারী শিক্ষার প্রসার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষিত নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি করে অংশ নিচ্ছেন। ১৯৯০-এর দশকে যেখানে কর্মসংস্থানে নারীর উপস্থিতি ছিল ২৪.৬৫%, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৩৭% হয়েছে। এটি দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক। এছাড়া দেশে পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০-৭৫%। শুধু শিক্ষাই নারীর একমাত্র অধিকার নয়। নারীর পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সমান অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) নং অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৮(২) নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের সুযোগও রাখা হয়েছে। এছাড়া ২৯ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সমান

সুযোগ লাভ করবেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের অগ্রযাত্রাকে সুষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে নারীদের জন্য বিভিন্ন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৬৫০ টাকা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা মাসিক ৬৫০ টাকা এবং দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ৮৫০ টাকা করা হয়েছে। এসকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সঠিক ব্যক্তি যাতে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন, সে জন্য 'ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (ডিএসআর)' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নারীদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। এতে করে নারীর আর্থিক সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় আরও বেগবান হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

বাংলাদেশে নরীরা বর্তমানে নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমবাজারে প্রবেশ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে প্রকৃত সমতা অর্জনের জন্য এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন- পারিবারিক সহিংসতা, সামাজিক অবস্থান, কর্মক্ষেত্রে আর্থিক বৈষম্যসহ নানারকম সমস্যা। বাংলাদেশে নারীর অধিকার রক্ষা ও নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সাংবিধানিক মর্যাদার পাশাপাশি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আইন রয়েছে। এই আইনগুলো নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। এগুলো মূলত সংবিধানের সমতা ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলোর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

পারিবারিক অধিকার নিশ্চিত করতে মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১; পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনগুলোর মাধ্যমে নারীর বিবাহ, ভরণ-পোষণ, তালাক, দেনমোহর, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও অভিভাবকত্ব বিষয়ে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়। নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার, অপহরণ ইত্যাদি বন্ধ ও কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০৩, ২০২০, ২০২৫ সালে সংশোধিত)। এই আইনের ২০২৫ সালে সংশোধিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ধর্ষণের মামলা তদন্তের সময় ৩০ দিন থেকে কমিয়ে ১৫ দিন এবং মামলার বিচার কাজ শেষ হওয়ার সময় ১৮০ দিন থেকে কমিয়ে ৯০ দিন করা হয়েছে। ফলে নারী নিপীরণের মামলার রায় প্রদান ত্বরান্বিত হবে পাশাপাশি এধরনের অপরাধও কমে আসবে। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মেয়েদের বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিশেষ পরিস্থিতি বাদে বাল্যবিবাহ সম্পাদন করলে শাস্তির বিধান রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২; সমান মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটি (৬ মাস),কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও বৈষম্যহীন পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদানে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮), স্বামী বা পারিবারিক সদস্য কর্তৃক সহিংসতার শিকার নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে গার্হস্থ্য সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১; মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ ইত্যাদি।

নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নিপীড়ন দমন করতে আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে। নারীদের সুরক্ষাজনিত সেবা আরও সহজীকরণ করা যেতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কলসেবা নম্বর ১০৯ সম্পর্কে নারীদের সচেতন করা যেতে পারে। নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আইসিটি, ই-কমার্স ও ডিজিটাল কর্মসংস্থানে নারীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি নীতি ও সামাজিক উদ্যোগে বাংলাদেশ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার, সুশীল সমাজ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যদি যৌথভাবে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে আইন প্রয়োগ, অর্থনৈতিক সমতা, সচেতনতা আর প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি বৈষম্যহীন নারীবান্ধব রাষ্ট্রে পরিণত হবে। পাশাপাশি ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধামুক্তি, সুস্থ জীবন, মানসম্মত শিক্ষা ও লিঙ্গ সমতাসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু কোনো লিঙ্গভিত্তিক বিষয় নয় বরং এটি একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক অগ্রগতি ও মানবিক বিকাশের সূচক। শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা যেমন জ্ঞানে ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়, তেমনি সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে তারা পায় বাঁচার নিশ্চয়তা ও সামাজিক মর্যাদা। তাই নারী যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সমাজে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে তার দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সকলের। নারী যখন নিরাপদ ও শিক্ষিত, তখনই একটি জাতি প্রকৃত অর্থে আলোকিত ও উন্নত হয়।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার